The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Volume 39, June 2025, ISSN 1813-0402

মালতীমাধব প্রকরণে সমাজভাবনা

[SOCIAL CONCEPT IN THE PRAKARANA OF MALATIMADHAVA]

Dr. Baby Biswas
Professor, Department of Sanskrit, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Volume 39, June 2025
ISSN: 1813-0402 (Print)

DOI:

Received : 17 February 2025
Received in revised: 27 October 2025
Accepted: 13 October 2025
Published: 10 November 2025

Keywords:
Prakarana, Polity, Religion, Education System, Artistry, Architecture, Bonds of Love, Status of Women.

ABSTRACT

In Sanskrit literature, kavya can be divided into two types—Shrabyakavya and Drishyakavya. The kavya that can only be heard is called Srabyakavya. The kavya that along with being heard can also be seen through the Performance of the actors on stage is called Drishyakavya. Again since through the acting of the Performers, one character's form is imposed upon another character, it is also called 'Rūpaka. According to the theory of Drishyakavya / Rūpaka has been divided into ten parts. Prakarana occupies the second position among these ten kinds of Rūpaka. In Sanskrit literature, Bhavabhuti was one of the prominent Playwrights among other such as Asvaghosa, Bhasa, Kalidasa, Sudraka etc. His three Drishyakavya named Mahaviracharita, Malatimadhava and Uttararamacharita made him the most famous of all. Three of them Mahaviracharita and Uttararamacharita are drama and Malatimadhava is prakarana. In Sanskrit literature most of the Rūpakas (Dramas) have been composed of history, Puranas or Popular legends. However, the prakarana type of Drishyakavya is composed based on real social events combined with the poet's imagination in which along with the people of the higher classes of society, the lives of ordinary People are also Portrayed. Through the story, characters, dialogues and analysis of the Prakarana of Malatimadhava, one can gain insight into the Political system, religion, education system, art and culture, architectural style, the Position of women and social values of that time are examined in the essay.

ভূমিকা

ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব অনুসারে সাহিত্য শব্দের প্রতিশব্দ হলো কাব্য। কবির ছন্দোবদ্ধ বা ছন্দোহীন যে কোনো রচনাই কাব্য বা সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত। সংস্কৃত সাহিত্যে এই কাব্যকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে– দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য। যে কাব্য শুধু শ্রবণ করা যায় তাকে শ্রব্যকাব্য বলে। আবার কুশীলবের অভিনয়ের মাধ্যমে সংলাপরূপী যে কাব্য শ্রবণের পাশাপাশি মঞ্চে দেখতে পাওয়া যায় তাকে দৃশ্যকাব্য বলে। বাংলা সাহিত্যের নাটক, ইংরেজি সাহিত্যের Drama-কে সংস্কৃত সাহিত্যে দৃশ্যকাব্য বলা হয়। আবার কুশীলবের অভিনয়ের মাধ্যমে একের রূপ অন্যের উপর আরোপিত হয় বলে একে রূপকও বলা হয়। নাট্যতত্ত্ব অনুসারে এই দৃশ্যকাব্য বা রূপককে দশটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এই দশটি দৃশ্যকাব্য বা রূপকের মধ্যে দ্বিতীয় রূপকের নাম প্রকরণ। সংস্কৃত সাহিত্যে অধিকাংশ রূপক বা দৃশ্যকাব্য রচিত হয়েছে ইতিহাস, পুরাণ বা লোকপ্রচলিত বিখ্যাত কাহিনিকে অবলম্বন করে। কিন্তু প্রকরণরূপী দৃশ্যকাব্য রচিত হয়েছে কবির কল্পনার মিশ্রণে সমাজের বাস্তবভিত্তিক ঘটনাকে অবলম্বন করে। সমাজের উঁচুশ্রেণির মানুষের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জীবনপ্রণালী বর্ণিত হয়েছে এই প্রকরণরূপী দৃশ্যকাব্যে। প্রস্তাবিত গবেষণা কর্মটি সাহিত্য নির্ভর, বিশ্লেষণধর্মী ও বিবৃতিমূলক। এ কারণে Content Analysis পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে '*মালতীমাধব* প্রকরণে সমাজভাবনা' প্রবন্ধটি লেখার চেষ্টা করা হয়েছে। *মালতীমাধব* প্রকরণের কাহিনি, চরিত্র, সংলাপ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সেকালে রাজ্যশাসন ব্যবস্থা, ধর্ম, শিক্ষাব্যবস্থা, শিল্পকলা-সংস্কৃতি চর্চা, স্থাপত্যশিল্প, নারীর অবস্থান, মানবচিত্তের প্রেমভাবনা প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে।

ভবভূতির পরিচয়

সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসোত্তরযুগে একজন অসাধারণ প্রতিভাবান নাট্যকার হলেন ভবভূতি। পণ্ডিতদের মতে, মহাকবি কালিদাসের পরেই তাঁর স্থান। তিনটিমাত্র দৃশ্যকাব্য— *মহাবীরচরিত*, *মালতীমাধব* ও *উত্তররামচরিত* রচনা করে তিনি

খ্যাতির শীর্ষে অবস্থান করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, এমন একজন প্রতিভাবান নাট্যকারের ব্যক্তিগত জীবন ও কাল সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করা অনেকটা কষ্টসাধ্য। তবে কবির নিজের লেখা দৃশ্যকাব্য তিনটিতে যে প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে সেগুলো বিশ্লেষণ করে তাঁর আত্মপরিচয় সম্পর্কে সামান্য ধারণা পাওয়া যায়। দক্ষিণপথের বিদর্ভ অঞ্চলের পদ্মপুর নামক গ্রামে ছিলো ভবভূতির বাসস্থান। তাঁর পিতামহের নাম ভট্টগোপাল এবং পিতার নাম গোপাল। তাঁর মাতার নাম ছিলো জাতুকর্ণী। তিনি ছিলেন কাশ্যপগোত্রীয় ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ শ্রোত্রিয় শ্রেণির। জন্মগতভাবে উপনয়ন সংস্কার নিয়ে উপযুক্ত জ্ঞানার্জনের মাধ্যমেই ব্রাহ্মণের শ্রোত্রিয় পর্যায়ে উন্নীত হন। কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখা ছিলো তাঁদের বংশানুক্রমিক চর্চার বিষয়। তাঁর বংশের উপাধি ছিলো উদুম্বর। কবির পূর্বপুরুষেরা নিত্য যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতেন; পঞ্চাগ্নির উপাসনা করতেন। সুনির্দিষ্ট তিথিতে তাঁদের গৃহে চান্দ্রায়ণব্রত, অগ্নিহোত্রযজ্ঞ, সোমযাগ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হতো। সোমযাগে তাঁরা সোমরস পান করতেন। ইহজাগতিক কিছু কর্মকাণ্ডও তাঁদের মধ্যে দেখা যায়। যেমন— ধনসঞ্চয় করা, সহধর্মিণীর প্রতি যত্নবান হওয়া, দীর্ঘায়ু কামনা করা ইত্যাদি। তবে এর উদ্দেশ্য মহৎ। তপস্যায় সিদ্ধিলাভের জন্য তাঁরা দীর্ঘায়ু কামনা করতেন। তাঁরা জনকল্যাণার্থে পূর্তকর্মের জন্য ধনসঞ্চয় করতেন এবং ভবিষ্যৎ উত্তরসূরী জন্মানোর জন্য স্বভার্যার প্রতি যত্নবান হতেন। সকলের পূজনীয় ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারা তাই ভোজনোৎসবে ভোজনপংক্তি পবিত্র করানো হতো। এজন্য তাঁদেরকে বলা হতো পংক্তিপাবন। তিনি ব্যাকরণ, মীমাংসা ন্যায়শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। ভবভূতির প্রকৃত নাম ছিলো শ্রীকণ্ঠ। কিন্তু শিবের উপাসক বলে তাঁকে ভবভূতি আখ্যা দেওয়া হয়।

ভবভূতির প্রকৃত নাম শ্রীকণ্ঠ নাকি ভবভূতি এ নিয়ে পণ্ডিত মহলে বিতর্ক রয়েছে। পণ্ডিত বেলভেলকারের মতে, শ্রীকণ্ঠ তাঁর প্রকৃত নাম যা পিতা-মাতা তাঁকে দিয়েছিলেন। তিনি মহাদেব শিবের (ভবের) কৃপা (ভস্ম) লাভ করেছেন বলে ভবভূতি হয়েছেন।[১] টীকাকার বীররাঘবের মতে, দ্বাদশ দিনে পিতা-মাতা শিশুর নামকরণ করেন, সেই নামই শ্রীকণ্ঠ। "সাম্বা পুনাতু ভবভূতিপবিত্রমূর্তিঃ"— এরূপ শ্লোক রচনা করে তিনি ভবভূতি হয়েছেন।"[২] টীকাকার জগদ্ধরও এই মত সমর্থন করেন।[৩] কিন্তু নাট্যকারের স্বপ্রণোদিত প্রস্তাবনা তিনটিতে তাঁকে ভবভূতি নামে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী সমালোচকরাও তাঁকে ভবভূতি নামেই উল্লেখ করেছেন। সেই হিসেবে ভবভূতি নাম মেনে নেওয়াই সঙ্গত মনে হয়।

ভবভূতির কাল

ভবভূতির কাল নির্ণয়ের দিকে অগ্রসর হওয়া যাক। এ বিষয়ে সমালোচকদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত লক্ষ করা যায়। ভবভূতির রচনায় কালিদাসের প্রভাব রয়েছে। দৃশ্যভাবনা, চরিত্রচিত্রণসহ বহুক্ষেত্রে ভবভূতি কালিদাসের (আনু. খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতক) কাছে ঋণী। যেমন– *অভিজ্ঞানশকুন্তল*-এর অদৃশ্য সানুমতী ও *উত্তররামচরিত*-এর ছায়াসীতা; *রঘুবংশ*-এর চিত্রদর্শন ও *উত্তররামচরিত*-এর চিত্রদর্শন, *অভিজ্ঞানশকুন্তল*-এর স্মারকচিহ্ন অঙ্গুরীয়ক ও *উত্তররামচরিত*-এর স্মারকচিহ্ন দণ্ডকারণ্য। এসকল কারণে ভবভূতিকে খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতকের পরবর্তী সময়ের কবি মনে করা যেতে পারে। সংস্কৃত সাহিত্যে গদ্যকাব্যকার বাণ তাঁর কাব্যে ভাস, কালিদাস প্রমুখ কাব্যকারদের নাম উল্লেখ করেছেন; কিন্তু ভবভূতির নাম উল্লেখ করেন নি। বিখ্যাত নাট্যকার ভবভূতির নাম বাণভট্ট জানতেন না অথবা জেনেও উল্লেখ করবেন না— এমনটি হওয়া অযৌক্তিক। অর্থাৎ ঐ সময়ে ভবভূতির জন্মই হয় নি। তাই ভবভূতিকে বাণভট্টের পরবর্তী সময়ের মনে করা যেতে পারে।[৪] ঐতিহাসিকেদের তথ্যানুসারে বাণভট্ট কাণ্বকুজ রাজ্যের (৬০৬-৬৪৮) সভাকবি ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি হর্ষচরিত রচনা করেন। তাই বাণভট্টের কাল খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতক ধরে ভবভূতিকে তার পরবর্তী সময়ের মনে করা যেতে পারে। আবার বামনের (খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতক) *কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি* নামক গ্রন্থে কিছু শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে যা ভবভূতির *উত্তররামচরিত*-এর প্রথম অঙ্কে[৫] এবং *মহাবীরচরিত*-এর দ্বিতীয় অঙ্কে[৬] দেখা যায়। অতএব, ভবভূতিকে বামনের অর্থাৎ খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকের অন্তত পূর্ববর্তী কাব্যকার মনে করা যেতে পারে। ভবভূতির জীবনে ঐতিহাসিক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। কলহনের *রাজতরঙ্গিনী* গ্রন্থে বলা হয়েছে, কাণ্বকুজরাজ যশোবর্মা বাক্‌পতিরাজ, ভবভূতি প্রমুখ কাব্যকারদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। আবার *গৌড়বহোকাব্যের* রচয়িতা বাক্‌পতিরাজ তাঁর কাব্য রচনার ক্ষেত্রে ভবভূতির উৎসাহ পেয়েছেন। এই ঋণ তিনি তাঁর *গৌড়বহো* কাব্যে স্বীকার করেছেন এবং রাজপৃষ্ঠপোষক যশোবর্মার গুণকীর্তণ করেছেন। ঐতিহাসিকদের মতে, কার্কটবংশীয় উত্তরপুরুষ ললিতাদিত্য (মুক্তাপীড়) কর্তৃক ৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে যশোবর্মা পরাজিত হন। আবার যশোবর্মার পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত ভবভূতিকে তাই খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষভাগের বা অষ্টম শতকের প্রথমভাগের কবি বলা যেতে পারে। কাল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রটি সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত। এ বিষয়ে কোন জটিলতার সুযোগ নেই। তাই তাঁকে খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষভাগের অথবা অষ্টম শতকের প্রথমভাগের কবি বলাই সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত। সুতরাং *মালতীমাধব* প্রকরণের সময়ও খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষভাগের বা অষ্টম শতকের প্রথমভাগের বলা যেতে পারে।

***মালতীমাধব* প্রকরণের বিষয়বস্তু**

মালতী ও মাধবের প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে নাট্যকার ভবভূতি রচনা করেন দশ অঙ্কের *মালতীমাধব* প্রকরণটি। মাঝখানে এসেছে মকরন্দ ও মদয়ন্তিকার প্রেমকাহিনী, যা প্রাসঙ্গিক কাহিনী হিসেবে পরিচিত। দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভূরিবসু ও দেবরাত

সহপাঠাবস্থায় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, উভয়ের ভবিষ্য সন্তানদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করবেন, যাতে বন্ধুত্ব আজীবন অটুট থাকে। পরবর্তীতে কর্মজীবনে উভয়েই মন্ত্রী হয়েছেন, গার্হস্থ্য জীবনে ভূরিবসুর কন্যা মালতী এবং দেবরাতের পুত্র মাধবের জন্ম হয়েছে। কিন্তু পূর্বপ্রতিশ্রুত শুভ পরিণয়টি এখনো ফলপ্রসূ হয়ে উঠে নি। এর কারণ রাজকামনাদৃষ্টি। পদ্মাবতীনগরেশ্বরের ইচ্ছা, মালতীর বিয়ে হবে তাঁরই নর্মসচিব নন্দনের সাথে। এই অবস্থায় রাজমন্ত্রিত্বে আসীন অসহায় ভূরিবসু ভগবতী কামন্দকীর শরণাপন্ন হয়েছেন। কামন্দকী একনিষ্ঠা বৌদ্ধসন্ন্যাসিনী। তবু ধর্মাচারণের উর্ধ্বে উঠে সর্বজনীন মানবপ্রেম নিয়ে এক্ষেত্রে তিনি এগিয়ে এসেছেন। সুপরিকল্পিত পদক্ষেপের মাধ্যমে তিনি প্রথমে মালতী ও মাধবের হৃদয়ে প্রগাঢ় প্রেমের জন্ম দিয়েছেন। বিকৃত তন্ত্রসাধক অঘোরঘণ্ট ও কপালকুণ্ডলা কর্তৃক অপহরণ করা মালতী বলিকাঠের নিচে বসেও প্রিয়জন মাধবের নামই স্মরণ করেছেন। মাধবও নিজের জীবন বাজি রেখে প্রেমিকাকে উদ্ধার করেছেন। উভয়ের প্রেমের গভীরতা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। তবুও অন্ধবিবেকী রাজা প্রেমিক-প্রেমিকাকে মূল্যায়ন না করে নন্দনের সাথে মালতীর বিবাহের সকল আয়োজন সম্পন্ন করেছেন। এই অবস্থায় কামন্দকীর নিখুঁত পরিকল্পনার মাধ্যমে মালতীর পরিবর্তে মালতী-সজ্জায় সজ্জিত মকরন্দের (মাধবের বন্ধু) সাথে নন্দনের বিবাহ সম্পন্ন করা হয়েছে। মালতী ও মাধবকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে গোপন স্থানে। অতঃপর নকল বিবাহের বিষয়টি অবগত হয়ে ক্রুদ্ধ রাজশক্তির সাথে মকরন্দের যুদ্ধ শুরু হয়। খবর পেয়ে মাধবও বীরবিক্রমে বন্ধুর সাহায্যার্থে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছেন। দুই বন্ধুর সম্মিলিত শক্তিতে রাজশক্তি পরাজিত হয়েছে। কিন্তু ইতোমধ্যে বামাচারী কাপালিক কপালকুণ্ডলা কর্তৃক মালতী দ্বিতীয়বার অপহৃত হয়েছেন। সেক্ষেত্রেও কামন্দকীর সাবেক শিষ্যা সৌদামিনীর সক্রিয় সহযোগিতায় মালতী ফিরে এসেছেন তাঁর বাবা-মায়ের কোলে। শেষে রাজস্বীকৃতিতে এবং আত্মীয়-স্বজনদের উপস্থিতিতে মালতীর সাথে মাধবের এবং মকরন্দের সাথে মদয়ন্তিকার (নন্দনের বোন) শুভপরিণয় সম্পন্ন হয়েছে।

মালতীমাধব প্রকরণে সমাজভাবনা

মালতীমাধব প্রকরণের কাহিনি, চরিত্র, সংলাপ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সেকালে রাজ্যশাসন ব্যবস্থা, ধর্ম, শিক্ষাব্যবস্থা, শিল্পকলা-সংস্কৃতি চর্চা, স্থাপত্যশিল্প, মানবচিত্তের প্রেমভাবনা, নারীর অবস্থান প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গগুলি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করা হলো :

রাজ্যশাসন ব্যবস্থা

ভবভূতির *মালতীমাধব* প্রকরণের সমাজে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিলো। প্রকরণে উল্লিখিত বিদর্ভরাজ্য ও পদ্মাবতীনগররাজ্য দু'টির রাজ্যশাসনকাঠামো বিশ্লেষণ করলে তাই প্রমাণিত হয়। সেখানে রাজা, রাজপার্ষদ, মন্ত্রী, অমাত্য, একান্ত সচিব, সেনা, রক্ষী ও অন্তঃপুরসহচরদের নিয়ে রাজ্য পরিচালনা করতেন। বিদর্ভরাজ্যের মন্ত্রী দেবরাত এবং পদ্মাবতীনগররাজ্যের মন্ত্রী ভূরিবসু দুজনেই ছিলেন বিদ্বান, দূরদর্শী এবং সম্মাননীয়। দেবরাতকে বলা হয় মন্ত্রীকূলচূড়ামণি। অন্যদিকে স্বীয় যোগ্যতার কারণে ভূরিবসুকে সামন্ত রাজারা পর্যন্ত অবনত মস্তকে প্রণাম জানান। ফলে সামন্তরাজাদের মাথায় বাঁধা ফুলের পরাগরেণুতে রাঙা হয়ে ওঠে ভূরিবসুর চরণ।[৭]

রাজতান্ত্রিক সমাজকাঠামোর সুযোগে তখনকার রাজাদের অনেকটা স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে। নিজেদের অদম্য বাসনা পূরণের ক্ষেত্রে এঁরা অনেকটা নির্লজ্জ, যুক্তিহীন ও একরোখা। পদ্মাবতী রাজ্যের রাজা কর্তৃক ঐ রাজ্যের অমাত্য ভূরিবসুর মাধ্যমে তাঁর কন্যা মালতীর সাথে উক্ত রাজ্যের নর্মসচিব নন্দনের বিবাহপ্রস্তাব ও আয়োজনই এর প্রমাণ। প্রকরণ অনুসারে ভূরিবসুর কন্যা মালতী ও দেবরাতের পুত্র মাধবের বিবাহ যেন সার্থক মণিকাঞ্চন। দুজনেই রূপবান, গুণবান, সুদর্শন, কুলীন ও বুদ্ধিমান। তাছাড়া এই বিবাহ ছিলো পূর্বপ্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পূর্বে সহপাঠাবস্থায় দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তাঁদের ভবিষ্যৎ পুত্রকন্যার মধ্যে তাঁরা বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করবেন, যাতে বন্ধুত্ব অটুট থাকে। অন্যদিকে নন্দন হলো পদ্মাবতী নগররাজ্যের নর্মসচিব যাকে গোপন বাসনা পূরণের সচিব বা কামতন্ত্রের সচিব বললেও অত্যুক্তি হবে না। এই বিগতযৌবনা, বিশ্রী নর্মসচিবের সাথে রাজা সুন্দরী যুবতী মালতীর বিবাহ প্রস্তাব দেন এবং বিবাহের পথে অগ্রসর হন। সমাজের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত রাজামাত্যের মেয়ের পক্ষে যদি এমনটি ঘটে তবে সাধারণ মানুষেরতো কথাই নেই। নরঘাতক, বিকৃত কাপালিক গোষ্ঠীর হাতে সমাজে যেমন নারীবলি ঘটেছে, তেমনি রাজকামনার দৃষ্টিতে সুন্দরী ললনাদের সাথে রাজার একান্ত সচিবদের বিবাহ ঘটেছে, যা জীবন্ত নারীবলিরই তুল্য। এভাবেই রাজতান্ত্রিক সমাজকাঠামোতে রাজার স্বৈরাচারিতা প্রকাশ পেয়েছে।

ধর্ম

মালতীমাধবের সমাজে দুই শ্রেণির ধর্মাচারী মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা— সনাতন ধর্মাচারী ও বৌদ্ধ ধর্মাচারী। এছাড়া সনাতন ধর্মের অন্তর্গত তন্ত্রসাধকদের সাধনচর্চা ও জীবনাচরণের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকরণটিতে প্রকাশ পেয়েছে। সনাতন ধর্মের অন্তর্গত পৌরাণিক দেব-দেবীভিত্তিক পূজার্চনা ও উৎসব-আনন্দের কথা প্রকরণটিতে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন—

মহাদেব শিবের পূজা, মদন দেবতার পূজা ইত্যাদি। সমাজে সর্বস্তরের মানুষের সমন্বয়ে এ সকল পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠিত হতো। পূজাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদযাপনও তখনকার সমাজে দেখা যায়। যেমন— কালপ্রিয়নাথের মন্দিরে শিবপূজা উপলক্ষ্যে নাট্যোৎসবের আয়োজন করা হয় এবং সমাগত সুধিবৃন্দ সার্বজনীনভাবে উক্ত নাট্যোৎসব উপভোগ করেন।[৮] আবার কৃষ্ণচতুর্দশী তিথিতে স্বচয়িত পুষ্পে শিবদেবতার অর্চনা করলে মঙ্গল লাভ হবে একথা বলে ভগবতী কামন্দকী মালতীকে শিবমন্দিরে নিয়ে আসেন। এছাড়াও তখনকার সমাজে মদন দেবতার পূজার্চনা অনুষ্ঠিত হতো। পূজা উপলক্ষ্যে যে উৎসব তাকে বলা হয় মদনমহোৎসব। মালতী-মাধবসহ সেখানে প্রচুর লোকসমাগম ঘটে। সুন্দরী মালতী এসময় ভিঁড়ের মধ্যে হারিয়ে যান। সুনির্দিষ্ট তিথিভিত্তিক এসকল পূজা-পার্বণ ছাড়াও তখনকার সমাজে সার্বজনীন মন্দিরে নিত্যপূজা ও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হতো। সন্ধ্যাবেলা শঙ্খধ্বনি শুনতে পাওয়াই তার প্রমাণ।[৯]

সনাতন ধর্মের পাশাপশি সমাজে বৌদ্ধধর্মের বিস্তারলাভ ঘটেছিলো। বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী কামন্দকী ও তাঁর অনুসারীরা এর উদাহরণ। সুশিক্ষিতা কামন্দকী পদ্মাবতীনগরে অবস্থিত বৌদ্ধমঠের অধ্যক্ষা। তাঁর পরনে ভিক্ষুবাস, কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি, হাতে কমণ্ডলু। ভিক্ষালব্ধ অন্ন দ্বারা তিনি জীবনধারণ করেন।[১০] তিনি এবং তাঁর অনুসারী অবলোকিতা, বুদ্ধরক্ষিতা প্রত্যেকেই বৌদ্ধধর্মের মহাযানী সম্প্রদায়ভুক্ত একথা বলাই যুক্তিযুক্ত। বৌদ্ধধর্মের হীনযানীরা একক মুক্তি কামনা করেন। বৌদ্ধধর্মের নিয়ম-কানুনকে কঠোরভাবে অনুসরণকে পারিবারিক ও সমাজিক জীবনকে পরিহার করে নির্বাণলাভের জন্য তাঁরা সাধনায় রতো হন।[১১] অন্যদিকে মহাযানীরা সার্বজনীন মানবপ্রেমী। একক মুক্তির পরিবর্তে জগতের দুঃখপীড়িত মানুষকে দুঃখ থেকে নিবৃত্ত করে শান্তি দেওয়ার মধ্যেই তাঁরা জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য পেতে পারে।[১২] ভগবতী কামন্দকী বৌদ্ধ ভিক্ষুণী হলেও সংসার ধর্মের আচার-আচরণ তিনি জানেন। রাজপ্রতিবন্ধকতা থাকলেও মালতী-মাধবের বিবাহের বিষয়ে তিনি এগিয়ে এসেছেন। মালতীর পিতা ভূরিবসুর অসহায়ত্বে তিনি সাহায্য করেছেন। দুটি মানব-মানবীর প্রেমের মূল্যায়ন না করে রাজার নর্মসচিব নন্দনের সাথে মালতীর বিবাহের বিষয়ে অগ্রসর হলেন। কামন্দকী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, "আমার জীবন দিয়ে হলেও মালতী-মাধবের বিবাহ সম্পন্ন করবো।[১৩] তাঁর এসকল ভূমিকা মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গুণাবলি প্রকাশ করে।

মহাযানী বৌদ্ধধর্মের উদারনীতির সুযোগে সে সমাজে কিছু অনাচার বাসা বেঁধেছিলো। প্রকরণটিতে তার প্রমাণ রয়েছে। ভগবান বুদ্ধ বৌদ্ধধর্মে নারীদের সন্ন্যাস গ্রহণের প্রবল বিরোধী ছিলেন। কিন্তু পরম ভক্তদের অনুরোধে শেষে এই নীতি থেকে সরে আসেন এবং নারীদের বৌদ্ধ ভিক্ষুণী হওয়ার অনুমতি দেন। পরে তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণী আচরণ সম্পর্কে কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করেন। যেমন— সঙ্ঘের অনুমতি ছাড়া একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিলে, দূরযাত্রায় বৌদ্ধ ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিলে, জনহীন স্থানে বৌদ্ধ ভিক্ষুণীকে নিয়ে বসলে বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য হবে।[১৪]

মালতী-মাধবের সমাজের নারীরা বৌদ্ধভিক্ষুত্ব গ্রহণ করেছেন এবং পুরুষের পাশাপাশি সমানতালে তাঁরা সামাজিক কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রেখেছেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের সংসারধর্ম ও প্রেম নিষেধ হলেও *মালতীমাধব* এর সমাজে তা সাবলীলভাবেই করা যেতো। ভৃত্য কলহংসের সাথে বুদ্ধরক্ষিতার প্রেমই তার প্রমাণ। অপরদিকে বৌদ্ধমঠকে মালতী-মাধবের বিবাহের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কামন্দকী সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী হলেও মালতীর বিরহে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এসকল আচরণ বৌদ্ধধর্মের আদর্শ বিচ্যুতিরই প্রমাণ।

সমাজে তন্ত্রসাধনচর্চা প্রচলিত ছিলো। তন্ত্রসাধকেরা শক্তির উপাসক। "জগতের সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের মূলে রয়েছে এক মহাশক্তি। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এই শক্তি ত্রিগুণাতীত, অব্যক্ত ও নির্বিশেষ। আবার লীলার ক্ষেত্রে তিনি অনন্তরূপিণী বিশ্বরূপা। জগৎ সৃষ্টির মূলে এই শক্তি লীলা করে চলেছে। তিনি শিবশক্তি শিবা, বিষ্ণুশক্তি বৈষ্ণবী বা ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মাণী। মানবদেহে তিনি নাদরূপে শব্দব্রহ্ম বা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি।"[১৫] সেই শক্তিকে সাধনা বা উপাসনার মাধ্যমে আয়ত্ত করা তন্ত্রসাধকদের মূল লক্ষ্য। সেজন্য তাঁরা নির্জন স্থানে গুরুর পাদপদ্মে বসে এই গুহ্যবিদ্যা আয়ত্ত করার সাধনায় রতো হন। *মালতীমাধব* এর সমাজে দুই শ্রেণির তন্ত্রমার্গের পরিচয় পাওয়া যায়। একটি আত্মকেন্দ্রিকতাপূর্ণ প্রতিহিংসাপরায়ণ; অন্যটি সার্বজনীন মানবকল্যাণে নিবেদিতাপ্রাণা শ্রেণি। অঘোরঘণ্ট ও তাঁর অনুগত শিষ্যা কপালকুণ্ডলা প্রথমটির উদাহরণ। শ্রীপর্বতে বসে সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর গুরু-শিষ্যা দু'জনে মিলে পদ্মাবতীনগরের অদূরে বাস করতে শুরু করেন। সাধনায় সিদ্ধিজাত শক্তির প্রয়োগে কপালকুণ্ডলা আকাশে উড়তেও সক্ষম। এই অবস্থার সাজসজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছদের একটি বিবরণ পাওয়া যায়। "রক্তবস্ত্রপরিহিত, রক্তচন্দনচর্চিত, শিরোজটাধারী কপালকুণ্ডলার কণ্ঠে নরকপালের মালা, কর্ণে নরকপালের কুণ্ডল। মালায় সংযুক্ত ক্ষুদ্র ঘণ্টা (কিঙ্কিনী), হাতে চিমটা (খট্টাঙ্গ), চিমটায় পতাকা।"[১৬]

তন্ত্রসাধকদের দেবী করালা বা চামুণ্ডা তার মূর্তিও বড় ভয়ঙ্কর। "করালাদেবীর পাতালতুল্য গলবিহ্বর, গলায় মুক্তার মালা, বিস্তৃতবাহু কেয়ূরতুল্য কালসাপে প্যাঁচানো, গায়ে হস্তীচর্মের উত্তরীয়, উত্তরীয়ের প্রান্তে হস্তীনখ। দেবীর হাতে খট্টাঙ্গ, খট্টাঙ্গে বাঁধা পতাকা। ত্রিনয়না দেবীর ললাটনেত্র ও মস্তক হতে অনবরত অগ্নি বিচ্ছুরিত হয়। সবকিছু মিলে দেবীকে বড় ভয়ঙ্কর মনে হয়।[১৭] সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর তাঁরা আরাধ্যদেবী করালাকে সন্তুষ্ট করার পূজায় রতো হন। এর একটি পর্ব

নারীবলি। মালতীকে অপহরণ করে নিয়ে এসে এরা দুজনে তাই দেবীর পায়ে উৎসর্গ করার উদ্দেশ্যে বলেন, ভগবতী চামুণ্ডে মন্ত্রসাধনের পূর্বে যে মানত করেছিলাম তা উপস্থিত করেছি, তুমি গ্রহণ করো। প্রকরণের ভাষায়,

> চামুণ্ডে! ভগবতি! মন্ত্রসাধনাদা-
> বুদ্দিষ্টামুপনিহিতাং ভজস্ব পূজাম্ ॥[১৮]

এরা প্রচণ্ড প্রতিহিংসাপরায়ণ। মাধবের হাতে গুরু অঘোরঘণ্ট নিহত হওয়ার পর কপালকুণ্ডলা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং প্রতিশোধ নেওয়ার বাসনায় সুযোগ খুঁজতে থাকেন, ঠিক সাপ যেমন প্রতিহিংসাপরায়ণ তেমনি। কপালকুণ্ডলা নিজেই তাঁর এই প্রতিহিংসাপরায়ণ বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করে বলেছেন, "সাপের সাথে শত্রুতাকারীর শান্তি কোথায়, যে তার দীর্ঘকালের বিদ্বেষ কখনো ভুলে যায় না। তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে বিষ উদ্গীরণকারী সেই সাপ শত্রুকে কামড়ানোর জন্য সদা তৎপর থাকে।"[১৯] পরে মালতীকে অপহরণ করে নিয়ে কপালকুণ্ডলা বলেন, "শ্রীপর্বতে নিয়ে গিয়ে টুকরো টুকরো করে তোকে অনেক কষ্ট দিয়ে মারবো।"[২০] বিকৃত প্রতিহিংসাপরায়ণ তন্ত্রসাধকদের পাশাপাশি তখনকার সমাজে সার্বজনীন মানবপ্রেমী তন্ত্রসাধকও ছিলেন। সৌদামিনী তার উদাহরণ। তিনি মালতীকে কপালকুণ্ডলার কবল হতে উদ্ধার করে মাধবের কাছে ফিরিয়ে দেন।

শিক্ষাব্যবস্থা

তখনকার সমাজের মানুষেরা যথেষ্ট শিক্ষিত ছিলো। শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ের সমান অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা সমাজে লক্ষ করা যায়। নিজদেশে উপযুক্ত জ্ঞানার্জন শেষে প্রয়োজনে তারা ভিনদেশেও গমন করতেন। ভূরিবসু, দেবরাত ও কামন্দকী তার উদাহরণ। এরা পদ্মাবতীনগররাজ্য ও বিদর্ভরাজ্যের অধিবাসী। অথচ জ্ঞানার্জনের জন্য এঁরা সবাই একস্থানে সমবেত হয়েছেন। নারী হয়েও ভগবতী কামন্দকীর জ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠা সত্যিই অতুলনীয়। কামন্দকীর পাণ্ডিত্য সম্পর্কে প্রকরণে বলা হয়েছে, "শাস্ত্রের প্রতি নিষ্ঠা, স্বাভাবিক বোধশক্তি, চতুরতা, গুণযুক্ত বাণী, কালবোধ, প্রতিভাশালিতা যা ঈপ্সিত ফল দান করে।"[২১]

উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের বিশেষ ক্ষেত্র ছিলো দর্শনশাস্ত্র, বিশেষ করে আন্বীক্ষিকীবিদ্যা। সাংখ্য, যোগ, লোকায়ত এই তিন দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয়ে তৈরি হয় আন্বীক্ষিকী বিদ্যা। ত্রয়ী (ঋক, সাম, যজুঃ), বার্তা (কৃষিকাজ ও পশুপালন), দণ্ড (রাজার শাস্তি) এই তিন বিদ্যার প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য বিচার করে যে বিদ্যা লোকসমাজের উপকার করে থাকে তাই আন্বীক্ষিকী। এ বিষয়ে অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে, "বলাবলে চৈতাসাং হেতুভিরন্বীক্ষমাণান্বীক্ষিকী লোকস্যোপকরোতি, ব্যসনেঽভ্যুদয়ে চ বুদ্ধিমবস্থাপয়তি, প্রজ্ঞাবাক্যক্রিয়াবৈশারদ্যং চ করোতি।"[২২] প্রকরণে দেখা যায় আন্বীক্ষিকী বিদ্যা শিক্ষার জন্য মাধব ও তাঁর বাল্যবন্ধু মকরন্দ নিজ জন্মভূমি কুণ্ডীননগর ছেড়ে পদ্মাবতীনগরে চলে আসেন।[২৩] তাই এই প্রাকৃতিক শোভামণ্ডিত পদ্মাবতীনগরী উচ্চশিক্ষার পীঠস্থান ছিলো একথা বলা যায়।

শিল্পকলা-সংস্কৃতি চর্চা

মালতীমাধবের সমাজে মানুষদের মধ্যে যথেষ্ট শিল্পকলা-সংস্কৃতি চর্চা লক্ষ করা যায়। নৃত্য, গীত, বাদ্য, ক্রীড়া প্রভৃতি শিল্পে তাঁরা যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে সৌখিনতার পাশাপাশি শিল্পকেও পেশাগতভাবে গ্রহণ করেছিলেন। প্রকরণের চৌরিকা-বিবাহ দৃশ্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। মালতীর বিবাহ উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণেরা নানাপ্রকার শ্রুতিমধুর মাঙ্গলিক স্তবস্তুতি করেছিলেন। নান্দীকারেরা প্রশংসা-স্তুতি করেছিলেন। আবার মালতীকে নগরদেবতার মন্দিরে নিয়ে আসার কালে তাঁর সামনে-পিছনে বিশাল বহর, সুসজ্জিত হস্তীবাহন, বাহনের উপরে সালঙ্করা কলানিপুণাগণিকারা নাচ-গান পরিবেশন করছে, শৈল্পিক ভঙ্গিতে মুখে তাম্বুল পুরে দিচ্ছে, মৃদঙ্গ বাজছে। বিশাল শব্দের আকাশ যেন মেঘের গর্জনের মতো মনে হচ্ছে।[২৪] সাজবহরের আগন্তুক মানুষদের মাথায় শ্বেতচ্ছত্র। দূর থেকে দেখে মনে হয় গগনের সরোবরে মৃণালদণ্ডের উপর অসংখ্য শ্বেতপদ্ম ফুটে আছে। একমাত্র পেশাগত শিল্পীদের দ্বারাই এরকম সাজসজ্জা ও নৃত্যগীত পরিবেশন সম্ভব তা বলাই যায়। মালতী ব্যক্তিগত জীবনে একজন শিল্পনিপুণা কন্যা। তিনি নৃত্যগীতিতে পারদর্শী ছিলেন। পাশাপাশি খেলাধুলায়ও তাঁর দক্ষতা ছিলো। বকুলবীথিতে মাধবকে দেখে তিনি যেন বিনা সঙ্গীতেই নেচে উঠেছিলেন।[২৫] কিন্তু মাধবের প্রতি বিরহগ্রস্ত মালতীর জীবনে ছন্দপতন ঘটে। খেলাধুলা, নাচগান ইত্যাদি থেকে তাঁর আগ্রহ উঠে যায়। ধাতবশিল্পের মধ্যে কাঁকন, নূপুর, অয়সকান্তমণি[২৬] (চুম্বক) চন্দ্রকান্তমণি[২৭] মুক্তা[২৮] মণি, কাঞ্চীদাম[২৯] ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। তখনকার অধিকাংশ বিনোদন উৎসবের বিনোদন কেন্দ্রগুলো ছিলো দেবতাকেন্দ্রিক এবং দেবতা মন্দিরসংশ্লিষ্ট। যেমন— মদনমন্দিরসংলগ্ন বকুলবীথি, শিবমন্দিরসংলগ্ন কুসুমাকর উদ্যান। দেবতার উৎসব পালনসহ সাধারণ মানুষেরা সেখানে আনন্দভ্রমণে আসতো।

স্থাপত্যশিল্প

প্রকরণটিতে উন্নত নগর সভ্যতার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীরবেষ্টিত সুদৃশ্য পদ্মাবতীনগরী যার উদাহরণ। এখানকার উন্নত প্রাসাদ, অট্টালিকা, বৌদ্ধমন্দির, নগরদেবতার মন্দির, কামদেবতার মন্দির ইত্যাদি যার উদাহরণ। প্রাসাদগুলোতে রয়েছে

সুদৃশ্য বাতায়ন, উন্নত সিঁড়ি, বিশাল দীঘি, সুদৃশ্য রাস্তাঘাট, শানবাঁধানো ঘাট ইত্যাদি স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন। বজ্রলেপ নামক এক ধরনের জোড়করণ পদার্থ দিয়ে তখনকার স্থাপত্যগুলো নির্মাণ করা হয়[৩০]— যা প্রকৌশলবিদ্যার উৎকর্ষ প্রমাণ করে।

মানবচিত্তের প্রেমভাবনা

তখনকার সমাজের অধিকাংশ মানুষেরা ভালোবাসার সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। পারিবারিক জীবনের গণ্ডি পেরিয়ে সমাজের অন্যান্য মানুষের মধ্যে তার বিস্তার ঘটেছিলো। এই ভালোবাসা যে শুধু নর-নারীর, যুবক-যুবতীর, রাগ-অনুরাগ, প্রেম-বিরহ, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া তা নয়; বরং দাস্যপ্রেম, সখ্যপ্রেম, বাৎসল্য প্রেম প্রভৃতি। আরও সহজভাবে বললে এটি মানুষের মধ্যে পারস্পরিক প্রভুভক্তি, গুরুভক্তি, পিতৃভক্তি, অপত্যস্নেহ, বন্ধুপ্রীতি ইত্যাদি রূপে প্রকাশ পায়। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রকরণের অনেক ক্ষেত্রে এর বিকাশ লক্ষ করা যায়। পদ্মাবতীনগরের প্রভাবশালী বুদ্ধিমান অমাত্য ভূরিবসু। সামন্ত রাজারা পর্যন্ত তাঁকে প্রণাম জানান। কিন্তু তাঁর হৃদয় প্রভূত পিতৃস্নেহে ভরপুর। পূর্বপ্রতিশ্রুতি অনুসারে নিজের কন্যা মালতীকে সুযোগ্য পুত্র মাধবের সাথে বিবাহ দিতে তিনি একান্তপ্রাণা। কিন্তু রাজপ্রতিবন্ধকতায় তিনি অগ্রসর হতে পারছেন না। এ অবস্থায় কন্যা মালতী বলেছেন, "মালতীর চাইতে রাজাকে সন্তুষ্ট করাই বাবার কাছে বড় হয়ে গেলো।"[৩১]

"নিষ্ঠুরতায় বাবার কাপালিকত্ব সম্পন্ন হলো।"[৩২] মালতী আক্ষেপ করে বলেছেন, আমার প্রশংসনীয় পিতা, সদ্বংশজ মাতাই আমার প্রিয়; সেই মাধবও আমার জীবনপ্রিয় নয়। প্রকরণের ভাষায়,

> জ্বলতু গমনে রাত্রৌ রাত্রাবখণ্ডকলঃ শশী
> দহতু মদনঃ কিংবা মৃত্যোঃ পরেণ বিধাস্যতঃ।
> মম তু দয়িতঃ শ্লাঘ্যস্তাতো জনন্যমলান্বয়া
> কুলমমলিনং ন ত্বেবায়ং জনো ন চ জীবিতম্ ॥[৩৩]

কিন্তু প্রকরণের শেষ অঙ্কে মালতী এর প্রকৃত কারণ জানতে পারেন এবং কন্যাবিরহে আত্মহত্যার সিদ্ধান্তকারী পিতার কথা জেনে মালতী বলেন, "হায় হায়! আমি পিতাকে ভুল বুঝেছিলাম।"[৩৪]

বৌদ্ধসন্ন্যাসিনী হলেও ভগবতী কামন্দকীর হৃদয়ে বাৎসল্যপ্রেমে ও বন্ধুপ্রীতিতে ভরপুর। ভূরিবসুর অসহায়ত্বে তিনি এগিয়ে এসেছেন। পদ্মাবতীশ্বর নিজের নর্মসচিব নন্দনের সাথে মালতীর বিবাহের ব্যাপারে অগ্রসর হলে তিনি বলেছেন, "আমি আমার জীবন দিয়ে হলেও মালতী ও মাধবের বিবাহের ব্যাপারে সচেষ্ট হবো।"[৩৫] ভূরিবসুর পরিবারের সাথে তিনি পূর্ব থেকেই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। মালতীকে তিনি নিজের মেয়ের মতো ভালোবাসেন, স্নেহ করেন। মালতীর ফুলের কলির মতো দাঁতের সৌন্দর্য, মুখের অস্পষ্ট কথা তিনি শুনেছেন। তাই মালতীর নিরুদ্দেশে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি বলেছেন, "কর্মফলে মিলন হবে না তাই প্রাণ বিসর্জন দিয়ে দেহের সন্তাপের নিবৃত্তি ঘটাবো।"[৩৬]

বন্ধুপ্রীতিশীলতার অনন্য দৃষ্টান্ত মাধব ও মকরন্দ এবং মালতী ও লবঙ্গিকা। মাধব ও মকরন্দ পরস্পরকে জানেন, বোঝেন, নিজের মনের কথা খুলে বলেন। দুজনেই পরস্পরের ধুলাখেলার সাথী। দুজনেই একসাথে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছেন। মাধবের জন্য মকরন্দ তাই নকল মালতী সাজার মতো ঝুঁকি নিয়েছেন। বিরহগ্রস্ত মাধবকে আর বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তাই মকরন্দ বলেছেন, "আমার আগে তুমি গুরুজনের তর্পণের জল পান করবে তা হতে পারে না।"[৩৭] তাই পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়ে মকরন্দ বলেছেন, "পরজন্মে তোমার যেখানে জন্ম হয় আমারও যেন সেখানে জন্ম হয়। আমি যেন আবার তোমার সহচর হতে পারি।"[৩৮]

লবঙ্গিকার সখিত্ব একেবারে নিঃস্বার্থ। মালতীর মনের গোপন ভালোবাসার কথা একমাত্র লবঙ্গিকাই জানেন। মালতীর প্রিয়জনের সাথে ছবি-বিনিময়, মালা-বিনিময় সবই ঘটেছে লবঙ্গিকার মাধ্যমে। *অভিজ্ঞানশকুন্তলের* শকুন্তলার প্রেম পরিস্ফুটনে নিঃস্বার্থ সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা অপরিমেয় ভূমিকা রেখেছেন অথচ ব্যক্তিগত জীবনে তাঁদের কোনো প্রাপ্তি ঘটেনি। লবঙ্গিকার ভালোবাসাও ঠিক তেমনি। লবঙ্গিকা নিজের পরিবারের ধাত্রীকন্যা হলেও মালতী তাঁকে একান্তই ভালোবেসেছেন। নিজের হৃদয় লবঙ্গিকার হৃদয়ে স্থাপন করে মালতী তাই মাধবকে দেখার বাসনা পোষণ করেন। আবার প্রিয়জন মাধবের সাথে মালতীর প্রেম কাঙ্ক্ষিত হলেও মাধবের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে তিনি বিরত থেকেছেন। লবঙ্গিকার বিরহই তাঁকে বিরত করেছে। এটিও বন্ধুপ্রীতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

বিকৃত তন্ত্রসাধক হলেও কপালকুণ্ডলা ও অঘোরঘণ্টের প্রেম বড় ঘনিষ্ঠ। গুরুর প্রতি অটুট ভক্তিপ্রবণা কপালকুণ্ডলা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন এবং গুরুর নির্দেশ অনুসারে বলির উপকরণ হিসেবে মালতীকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছেন। গুরু হত্যার প্রতিশোধপ্রবণা কপালকুণ্ডলা তাই মালতীকে দ্বিতীয়বার অপহরণ করে বলেছেন, "মালতীকে শ্রীপর্বতে নিয়ে গিয়ে টুকরো টুকরো করে অনেক কষ্ট দিয়ে মারবে।"[৩৯] গুরুর প্রতি ভক্তি থেকেই তাঁর এই প্রতিশোধপ্রবণতা প্রকাশ পায়। ভগবতী কামন্দকীর প্রতি বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীসহ অনেকেই অটুট ভক্তিপ্রবণ। তাঁর সাবেক শিষ্যা সৌদামিনীও তাঁকে ভালোবাসেন, ভক্তি করেন। মানবপ্রেমী সৌদামিনী কপালকুণ্ডলার কবল হতে মালতীকে উদ্ধার করে মাধবের কাছে ফিরিয়ে

দিয়েছেন যা বোধিসত্ত্বের সাথে তুলনীয়। এ কারণে প্রকরণে তাঁকে কনিষ্ঠা ভগবতীর বিশেষণ দেওয়া হয়েছে। ভগবতী কামন্দকীই এখানে সকলের কাছে জ্যেষ্ঠা ভগবতী। এভাবে পারিবারিক গণ্ডি পেরিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে অটুট ভালোবাসা তখনকার সমাজে বিরাজমান ছিলো ।

নারীর অবস্থান

মালতীমাধব এর সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষদের সমান ভূমিকা, সমান অবস্থান লক্ষ করা যায়। ব্যক্তির জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি, ব্যক্তির প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, সামাজিক ও পেশাগত দায়িত্বের ক্ষেত্রে ব্যক্তির কর্মতৎপরতা সবকিছু মিলে সামাজিক অবস্থান তৈরি হয়। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষের ভূমিকা প্রায় সমানে সমান। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যেমন— কর্মপরিকল্পনা ও নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে *মালতীমাধব* এর সমাজে নারীচরিত্র অগ্রগামী। ভগবতী কামন্দকীর ভূমিকাই তার অনন্য উদাহরণ। রাজশক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান করেও সঠিক পরিকল্পনা ও কৌশলের মাধ্যমে মালতী-মাধবের শুভ পরিণয় ঘটিয়েছে। ভাসের *স্বপ্নবাসবদত্ত* নাটকের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ, বিশাখদত্তের *মুদ্রারাক্ষস* নাটকের মন্ত্রী চাণক্য রাজ্যোদ্ধার বা রাজক্ষমতাকে নিষ্কণ্টক করার ক্ষেত্রে মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে ভূমিকা রেখেছেন। কিন্তু *মালতীমাধব* এর কামন্দকী কোনো রাজ্যোদ্ধার ও রাজক্ষমতার জন্য নয়; মালতী-মাধবের মিলনের জন্য, জীবনে জীবন যোগ করার জন্য মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে সফল হয়েছেন। যুদ্ধবিগ্রহ, পেশীশক্তিপ্রদর্শন ও সাহসিকতার ক্ষেত্রে নারী অপেক্ষা পুরুষরাই এগিয়ে ছিলেন। ভয়ঙ্কর শার্দূলের সাথে লড়াই, চণ্ডকাপালিকদের সাথে যুদ্ধ, রাজসৈন্যদের সাথে যুদ্ধই তার প্রমাণ। *মালতীমাধবের* মাধব ও মকরন্দ দুজনেই শক্তিমান পুরুষ। *উত্তররামচরিত* ও *মহাবীরচরিত* নাটকে পেশীশক্তি প্রদর্শনের সাথে সাথে আগ্নেয়াস্ত্রেরও প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু *মালতীমাধব* এর মাধব ও মকরন্দের যুদ্ধ তাঁদের সাহস ও বাহুশক্তির উপরেই নির্ভরশীল। রাজসৈন্যরা মকরন্দের উপর অসি নিয়ে আক্রমণ করলেও মাধব ও মকরন্দ বাহু দিয়েই তাদের প্রতিহত করেন।[৪০] কিন্তু পুরুষের এই শক্তি প্রদর্শনের পিছনে রয়েছে নারীর প্রেরণা ও উৎসাহ। জীবনের প্রতি হতাশাগ্রস্ত মাধব শ্মশানে ভূত-প্রেতদের কাছে নরমাংস বিক্রি শুরু করেন। আবার প্রিয়জন মালতীর সাক্ষাতে হতাশা থেকে তার উত্তরণ ঘটে। তাই জগৎসংসার তার কাছে সারযুক্ত, ত্রিভুবন রত্নযুক্ত এবং পৃথিবী আলোময় মনে হয়েছে। তাই তিনি কাপালিকাধম অঘোরঘণ্টকে যুদ্ধে নিহত করতে পেরেছেন।[৪১] তখনকার সমাজে নারীরা একধরনের রক্ষণশীলতার মধ্যে আবদ্ধ ছিলো। এই রক্ষণশীলতা প্রাচীন ভারতের হিন্দু সমাজের কুলীন কন্যার রক্ষণশীলতা। ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব ও অলঙ্কারশাস্ত্র অনুসারে নায়ক-নায়িকার উল্লিখিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য কৌলিন্য।[৪২] আবার *অর্থশাস্ত্র* অনুসারে, অমাত্যগুণের ক্ষেত্রে কুলীন হওয়া আবশ্যক। *অর্থশাস্ত্রে* বলা হয়েছে, "অভিজনপ্রজ্ঞাশৌচশৌর্যানুরাগযুক্তানমাত্যান্।"[৪৩] প্রকরণটিতে মাধবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনার ক্ষেত্রে বলা হয়, তিনি সদ্বংশজ। এ প্রসঙ্গে কামন্দকী তাঁর পিতার প্রশংসা করে বলেছেন, "যাঁর শ্বেতবর্ণসদৃশ যশ ও মান দিগন্তরেখাগুলোকে এক করে দিয়েছে, যিনি প্রবল পবিত্র কাজের আশ্রয়, যিনি সমস্ত সমৃদ্ধির পাত্র, তাঁর মতো পুরুষ জগতে খুব কমই হয়ে থাকে।"[৪৪] আবার মালতীর ক্ষেত্রেও বলা হয় তাঁর পিতা-মাতার জন্ম সদ্বংশে। তাই মালতী-মাধবের মিলন কাঙ্ক্ষিত হলেও মালতী বলেছেন, "আমার পিতার বংশই আমর প্রিয়; মাধব নয়।"[৪৫] তাই পিতা-মাতার বংশমর্যাদা রক্ষার জন্য মালতী মাধবকে নিয়ে গৃহত্যাগী হয়ে তাঁর প্রেমকে সার্থক করতে পারেন নি। এ বিষয়ে M.R. Kale বলেন, "Although deeply wounded by the shafts of love she does not like the very idea of a love-marriage without the consent of her parrents; she would rather die than tarnish the honour of her family, which she prizes above all earthly things, by a rash marriage."[৪৬] প্রকরণের নবম অঙ্কে নগরদেবতার মন্দিরে মালতীর এই রক্ষণশীলতা আবারও প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে মালতী নিজের হৃদয় লবঙ্গিকার হৃদয়ে স্থাপন করে হলেও প্রিয়জন মাধবের মুখচন্দ্র দর্শন করার বাসনা প্রকাশ করেছেন। এসময় জলভরা আবছা চোখে তিনি ভুলক্রমে লবঙ্গিকাকে আলিঙ্গন করার পরিবর্তে মাধবকে আলিঙ্গন করে বসেন। উপস্থিত কামন্দকী তখন বলেন, "তোমার প্রতি যার এবং যার প্রতি তোমার প্রথম নয়নের প্রীতি জন্মেছিলো, অতঃপর মনের একাগ্রতা ও শরীরের কৃশতা জন্মেছিলো এই সেই তোমার প্রিয় যুবা। হে সুমুখী, জড়তা ত্যাগ করো। বিধাতার নিপুণতা ফুটে উঠুক, কামদেবতার অভিলাষ পূর্ণ হোক।"[৪৭] উপস্থিত লবঙ্গিকাও মাধবকে গ্রহণ করার জন্য বলেন, "মহানুহাব! হিঅএ বি অপ্পরিহদ-সঅংগাহ-সাহসী অঅং জণো কিং দাণিং করগ্‌গহণে বিআরেদি।"[৪৮] কিন্তু মালতী বলেন, "হায় হায়! আমি যে কুলকন্যা, কুলকন্যাদের পক্ষে এ কেমন অশোভন কথাবার্তা বলছো?"[৪৯] এখানে প্রকৃতপক্ষে সমাজের কৌলিন্য প্রথাই মালতীর মাধবকে গ্রহণ করা থেকে বিরত রেখেছে। কিন্তু তখনকার সমাজের নারীরা কৌলিন্য সংস্কার থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। কামন্দকী তাই বলেছেন, বিধাতা, কামদেব ও আমি এই তিনজন আনন্দের সাথে যোগ্য মাধবের হাতে মালতীকে দান করলাম। এখানে কামন্দকীর উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও কৌলিন্য সংস্কার থেকে মানুষের বেরিয়ে আসার প্রমাণ পাওয়া যায়।

উপসংহার

মানবসমাজ পরিবর্তনশীল। সময়ের পরিবর্তনে, যুগের চাহিদায়, ভিন্ন পরিবেশে মানব চরিত্রের চাহিদাও ভিন্ন। *মালতীমাধব* প্রকরণে বৌদ্ধসন্ন্যাসিনী অথচ সার্বজনীন মানবপ্রেমী কামন্দকী চরিত্রের ভিতর দিয়ে রাজশক্তির স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে সুকৌশলে কাজ করায়েছেন। মাধব ও মকরন্দও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। বিখ্যাত উৎসভিত্তিক প্রত্যক্ষ চরিত্রের

মাধ্যমে ভবভূতি যে কথা বলতে পারেন নি কল্পিত চরিত্রের মাধ্যমে তা তুলে ধরেছেন *মালতীমাধব* প্রকরণে। শেষ পর্যায়ে রাজশক্তি সংশোধিত হয়েছে। সমাজের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তৎকালীন ভবভূতির *মালতীমাধব* কাব্যের সমাজ এবং বর্তমান সমাজব্যবস্থার অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিল রয়েছে। কিছু বিষয় ভিন্ন আঙ্গিকে ভিন্ন আবরণে এখনও সমাজে বিরাজ করছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্তমান আধুনিক সমাজব্যবস্থা থেকে তখনকার সমাজ ছিলো অধিকতর উন্নত। যেমন বর্তমান সমাজে এখনো বিকৃত তন্ত্রসাধক, সাধনচর্চা, পূজা-পার্বণ, শ্মশানভিত্তিক মাতৃপূজা, ভূত-প্রেত, পিশাচ ইত্যাদি দেখা যায়। শরীরতত্ত্বীয় সাধনপ্রক্রিয়ায় এরা কতটুকু উন্নত তা প্রশ্নসাপেক্ষ। কিন্তু সাধনায় সিদ্ধিলাভের বলিদানপ্রথা এখনো সমাজে প্রচলিত। এর মধ্যে সরাসরি নরবলি না হলেও সার্বজনীন মন্দিরে এখনো পশুবলি দেওয়া হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটকের মতে, সার্বজনীন মাতা কখনো সন্তানের রক্তে রঞ্জিত হয়ে তৃপ্ত হতে পারেন না। *মালতীমাধব* এর মাধবের দৃষ্টিকোণেও এই জগৎসংসারকে সারযুক্ত, রত্নযুক্ত, আলোকযুক্ত করার জন্য বিকৃত তন্ত্রসাধকদের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তাই মাধবের প্রেম একক মালতীতে সীমাবদ্ধ না থেকে ভবভূতির *মালতীমাধব* কাব্যে সার্বজনীন মানবপ্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে। তখনকার রাজতান্ত্রিক সমাজকাঠামোতে স্বৈরাচারি রাজাদের অনেকটা স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে। নীতিশাস্ত্রজ্ঞ, কূটনীতিজ্ঞ, বিদ্বান, রাজমন্ত্রীরাও সবসময় লম্পট রাজাদের গোপন বাসনা পূরণে সমস্ত বুদ্ধি ও কৌশলের প্রয়োগ করতেন। ভবভূতির *মালতীমাধব* কাব্যে পদ্মাবতীশ্বরের মন্ত্রী ভূরিবসু এর উদাহরণ। পদ্মাবতীনগরের রাজা সরাসরি নিজের বিকৃত ইচ্ছা পূরণের জন্য মন্ত্রী বা মন্ত্রীকন্যার মতামতকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করেছেন। শেষে *মালতীমাধব* কাব্যে ভালোবাসার শক্তির কাছে পদ্মাবতীনগরের রাজার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। সার্বজনীন মানবপ্রেমী নারীচরিত্র কামন্দকী বৌদ্ধসন্ন্যাসিনী হয়েও সার্বজনীন মানবধর্মের পরিচয় দিয়েছেন। ভবভূতির সমাজে রাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় গণতন্ত্রের সুযোগ ছিলো না। বর্তমান সমাজে অনেকক্ষেত্রে গণতন্ত্রের আবরণে স্বৈরতন্ত্রই প্রচলিত থাকতে দেখা যায়। গণরায় বা গণভোট সেখানে ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতা পোক্ত করার একটি অপকৌশল মাত্র। একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে প্রযুক্তিবিদ্যার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। চিকিৎসা, প্রকৌশল, যোগাযোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে তার প্রভাব লক্ষ করা যায়। তখনকার সমাজের মানুষের মধ্যে একটি সুদৃঢ় পারিবারিক বন্ধন বিরাজমান ছিলো। অপত্য স্নেহ, বন্ধুপ্রীতি এসবই তার উদাহরণ। ভূরিবসুর অপত্য স্নেহ, মকরন্দের বন্ধুপ্রীতি, লবঙ্গিকার বন্ধুপ্রীতি এসবের ভিতর দিয়ে তা প্রকাশ পেয়েছে। বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতায় প্রকৃতিবিচ্যুত মানুষ প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসাশূন্য হয়ে পড়েছে। তাই সমাজে দেখা দিয়েছে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি। পরিশেষে বলা যায় ধর্মকে মানব কল্যাণের কাজে লাগানো, প্রযুক্তির ঠিক ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ, জনগণের মতামতের মূল্যায়ন করা, সুদৃঢ় পারিবারিক বন্ধন সৃষ্টি করা ইত্যাদি ভবভূতির *মালতীমাধব* কাব্যের মূল গ্রহণীয় বিষয়। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে দেশ, জাতি তথা মানবসভ্যতাকে সুন্দর করার জন্য এসকল বিষয়গুলো আমাদের অনুসরণ করা উচিত বলে মনে করা হয়।

তথ্যনির্দেশ

১ "He bore the title Srikantha, was well-versed in Grammer (sabda), Mimansa (vakya), and Logic (pramana)'n. His preceptor was jnananidhi."— Vimla Gera, *Mind and Art of Bhavabhuti* (Delhi: The Sanskrit book depot. 1973), p. 1.

২ "দ্বাদশেঽহনি পিতা নাম কুর্যাৎ ইতি পৈত্রিকং নামধেয়মিদম্ ।.....এতৎকৃতঃ 'সাম্বা পুনাতু ভবভূতিপবিত্রমূর্তিঃ' ইতি শ্লোকশ্রবণসন্তুষ্টো রাজা ভবভূতিরিত্যেনং খ্যাপয়ামাসেতি ।"— বীররাঘব (টীকাকার), ভবভূতি, *উত্তররামচরিতম্*, সীতানাথ আচার্য ও দেবকুমার দাস সম্পা. (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৮), ১ম অঙ্ক, পৃ. ৬।

৩ জগদ্ধর (টীকাকার), ভবভূতি, *মালতীমাধবম্*, হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য, সম্পা. (কলকাতা: সিদ্ধান্তবিদ্যালয়, ৩য় সংস্করণ, ১৮৫৮ শকাব্দ), ১ম অঙ্ক, পৃ. ১৪।

৪ We may say that he must have flourished later than Bana (generally placed in the first half of the 7th century) who mentions several authors and works such as Kalidasa, Bhasa, Pravara-sena, Vasavadatta and Bihatkatha but is silent about Bhavabhuti; and who must have lived before the second quarter of the 8th century, for, he is referred to by Vakpatiraja (Bappairaa) belonging to the second quarter of the 8th century.— Vimla Gera, *Mind and Art of Bhavabhuti op. cit.* p. 19.

৫ ভবভূতি, *উত্তররামচরিতম্*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫–৬; বামন, *কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তিঃ*, অনিল চন্দ্র বসু সম্পা. (কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৭৭), ৪/৩/৬।

৬ ভবভূতি, *মহাবীরচরিতম্*, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১৩*শ* খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, ১/৫৪; বামন, *কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তিঃ*, *প্রাগুক্ত*, ১/২/১২।

৭ "সামন্তমস্তকোত্তংসপরাগরঞ্জিতচরণাঙ্গুলেরমাত্যভূরিবসোঃ"— ভবভূতি, *মালতীমাধবম্*, হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ-ভট্টাচার্য, সম্পা. (কলকাতা: সিদ্ধান্তবিদ্যালয়, ৩য় সংস্করণ, ১৮৫৮শকাব্দ), ৬ষ্ঠ অঙ্ক, পৃ. ৩৫৬।

৮ *তদেব*, ১ম অঙ্ক, পৃ. ১৯-২০।

৯ "ক্ষিপন্নিদ্রামুদ্রাং মদনকলহচ্ছেদসুভগা-
মুপাত্তোৎকল্পানাং বিহগমিথুনানাং প্রথমতঃ।
দধানঃ সৌধানামলঘুষূ নিকুঞ্জেষু ঘনতা-
মসৌ সন্ধ্যাশঙ্খধ্বনিরনিভৃতঃ খে বিচরতি ।"— *তদেব*, ২/১২।

১০ "চীরচীবরমেত্তপরিচ্ছদং পিণ্ডপাঅমেত্তপাণউত্তিং বি ।"— *তদেব*, ১ম অঙ্ক, পৃ. ২৬।

১১ প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, ভারতীয় দর্শন, ১*ম খণ্ড* (কলকাতা: ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ১০ম সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৮০), পৃ. ১৭৬-১৭৮।
১২ *তদেব*, ১৭৮-১৭৯।
১৩ "তৎসর্বথা সঙ্গমনায় যত্নঃ প্রাণব্যয়েনাপি ময়া বিধেয়ঃ ॥"— ভবভূতি, *মালতীমাধবম্*, *প্রাগুক্ত*, ৪/৫।
১৪ দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎবঙ্গ*, ১*ম খণ্ড* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৯), পৃ. ৩২০-৩২১।
১৫ জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, *প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার*, ১*ম খণ্ড* (কলকাতা: ডি. এম. লাইব্রেরী, ২য় সংস্করণ, ২০০৪), পৃ. ১৩৮।
১৬ ভবভূতি, *মালতীমাধবম্*, *প্রাগুক্ত*, ৫/৩-৪।
১৭ *তদেব*, ৫/২২-২৩।
১৮ *তদেব*, ৫/২৫।
১৯ *তদেব*, ৬/১।
২০ "যাবচ্ছ্রীপর্বতমুপনীয় তিলশো এনাং নিষ্কৃত্য দুঃখমারিণীং করোমি।"— *তদেব*, ৮ম অঙ্ক, পৃ. ৪৫৪।
২১ *তদেব*, ৩/১১।
২২ কৌটিল্য, *কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্*, মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা. (কলকাতা সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১ম সংস্করণ, অগ্রহায়ণ, ১৪০৪), ১/২/২, পৃ. ১২।
২৩ "জং দাণিং চীরচীবরমেত্তপরিচ্ছদং পিণ্ডপাঅমেত্তপাণউত্তিং বি।"— *তদেব*, ১ম অঙ্ক, পৃ. ২৬।
২৪ *তদেব*, ৬/৪।
২৫ "তুমং বি সহাবেণ এব্ব তস্সিং অবসরে অসংগীদঅং ণত্তিদাসি।"— *তদেব*, ২য় অঙ্ক, পৃ. ১০৮।
২৬ *তদেব*, ১ম অঙ্ক, পৃ. ৫৯।
২৭ *তদেব*, ৩/৫।
২৮ *তদেব*, ৬ষ্ঠ অঙ্ক, পৃ. ৩৩০।
২৯ *তদেব*, ১ম অঙ্ক, পৃ. ৬৪।
৩০ "লীনেব প্রতিবিম্বিতেব লিখিতেবোৎকীর্ণরূপেব চ
প্রত্যুপ্তেব চ বজ্রলেপপটিতোবান্তর্ণিখাতেব চ।
সা নশ্চেতসি কীলিতেব বিশিখৈশ্চেতোভুবঃ পঞ্চভি-
শ্চিন্তাসন্ততিতন্তুজালনিবিড়স্যূতেব লগ্না প্রিয়া ॥"— *তদেব*, ৫/১০।
৩১ "রাআরাহণং কখু তাদস্স গুরুঅং, ণ উণ মালদী।"— *তদেব*, ২য় অঙ্ক, পৃ. ১৩২।
৩২ "নিব্বূঢ়ং অ ণিক্করুণদাএ তাদস্স বি কাবালিত্তণং।"— *তদেব*, ৪র্থ অঙ্ক, পৃ. ২৩৭।
৩৩ *তদেব*, ২/২।
৩৪ "মএ উণ অণজ্জাএ ণিরণুক্কোসা তুহ্মে ত্তি সংভাবিদং আসি।"— *তদেব*, ১০ম অঙ্ক, পৃ. ৫৭৭।
৩৫ *তদেব*, ৪/৫।
৩৬ *তদেব*, ১০/৭।
৩৭ *তদেব*, ৯/৪০।
৩৮ *তদেব*, ৯/৪১।
৩৯ "যাবচ্ছ্রীপর্বতমুপনীয় লবশো লবশ এনাং নিষ্কৃত্য দুঃখমরণাং করোমি।"— *তদেব*, ৮ম অঙ্ক, পৃ. ৪৫৪।
৪০ *তদেব*, ৫/৩৪।
৪১ *তদেব*, ৫/৩০।
৪২ "ত্যাগী কৃতী কুলীনঃ সুশ্রীকো রূপযৌবনোৎসাহী।
দক্ষোঽনুরক্তলোকস্তেজোবৈদগ্ধ্যশীলবান্ নেতা ॥
নায়কসামান্যগুণৈর্ভবতি যথাসম্ভবৈর্যুক্তা ॥"— বিশ্বনাথ কবিরাজ, *সাহিত্যদর্পণ*, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পা.
(কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ), ৩/৩৬, ৩/৬৯।
৪৩ কৌটিল্য, *কৌটিলীয়ম অর্থশাস্ত্রম্*, *প্রাগুক্ত*, ১/৮/৩, পৃ. ২৬।
৪৪ ভবভূতি, *মালতীমাধবম্*, *প্রাগুক্ত*, ২/৯।
৪৫ *তদেব*, ২/২।
৪৬ Bhavabhuti, *Malatimadhavam*, M. R. Kale ed. (Bomby: Messrs Gopal Narayen and Co. 2nd edition, 1928), p. 38.
৪৭ "পুরশ্চক্ষূরাগস্তদনু মনসোঽনন্যপরতা
তনুগ্লানির্যস্য ত্বয়ি সমভবদ্যত্র চ তব।
যুবা সোঽয় প্রেয়ানিহ সুবদনে মুগ্ধ জড়তাং
বিধাতুর্বৈ দগ্ধ্যং বিলসতু সকামোঽস্তু মদনঃ ॥"— ভবভূতি, *মালতীমাধবম্*, *প্রাগুক্ত*, ৬/১৫।
৪৮ *তদেব*, ৬ষ্ঠ অঙ্ক, পৃ. ৩৫২।
৪৯ "হদ্ধি, কণ্ণনআজণাবিরুদ্ধং কিং বি উবণ্ণস্সদি।"— *তদেব*, ৬ষ্ঠ অঙ্ক, পৃ. ৩৫৩।